গণেশ পাইন
(১৯৩৭ - ২০১৩)

২০১২ সালের শেষ দিক থেকে বাঙালী জীবনে কয়েকটি ইন্দ্রপতন হল। প্রথমে রবিশঙ্কর তারপর সুনীল, শেষে গণেশ পাইন। মধ্য কলকাতার কলুটোলার একান্নবর্তী বৈষ্ণব পরিবারে পুরাণ, পদাবলী, তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরোপি সহিষ্ণুতার আবহে গণেশের বেড়ে ওঠা। অথচ বিপরীতধর্মী '৪৬-র ঘাতক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ও ৭০-৭২-র নিধন যজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী হয়ে তাঁর শিল্প সমাহিত মনের অন্দরে এক গভীর ক্ষত সৃষ্টি হল যা বিভিন্ন আঙ্গিকে বারবার ফিরে এসেছে তাঁর তীক্ষ্ণ শক্তিশালী তুলির টানে, কৌণিক আলোছায়া মাখা গাঢ় প্রতিকৃতিগুলিতে এবং অপরূপ মায়াময় বিষণ্ণ স্নিগ্ধ পরাবাস্তবময় ক্যানভাসের প্রতিচ্ছায়া প্রতিবেশে। অল্প বয়সে পিতৃহারা, অর্থকষ্ট, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে উঠতে না পারা, ব্যক্তি জীবনে আঘাত কোন কিছুই তাঁকে তাঁর আশৈশব ভাললাগা ছবি আঁকা থেকে সরাতে পারেনি। স্বীয় প্রতিভায় সহজেই সরকারি আর্ট কলেজে সরাসরি দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হন এবং স্নাতক হন। গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথদের 'বেঙ্গল স্কুল' থেকে 'এক্সপ্রেশনিজমে'র কূল চূড়ামণি রেমব্রান্ট, পল ক্লিদের দ্বারা এবং নব্য-মধ্যযুগীয় মুঘল মিনিয়েচার অঙ্কনে গভীরভাবে প্রভাবিত হলেও সৃষ্টি করেছিলেন এক নিজস্ব সমসাময়িক রীতি, যেখানে জীবন সবসময় মৃত্যু, বিষাদ, ভয়, নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা আর আঁধারকে অতিক্রম করে। জল রং, তেল রং, প্যাস্টেল, গুয়াশ, মিশ্র মাধ্যম সবেতেই সিদ্ধহস্ত হলেও বিশেষ ঝোঁক ছিল টেম্পারার কাজে। পেটের দায়ে একসময় ইলাসস্ট্রেশন, পোস্টারিং, অ্যানিমেশন, ড্রাফটসম্যনের কাজ করলেও দীর্ঘদিন কোন স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা করতে পারেননি। ১৯৬৭-র পর ছবি বিক্রি শুরু হয়, ১৯৭০-এ লন্ডনের 'সদবি'তে ছবি নিলামের পর থেকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। তারপর থেকে তাঁর ছবি সংগ্রহের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। সংগ্রাহকদের মধ্যে ছিলেন ইহুদি মেনুহিন, শিল্প সংগ্রাহক হেরউইজ দম্পতী, ইন্দিরাগান্ধী প্রমুখ। তিনি কিন্তু আমৃত্যু একই রকম নিরাসক্ত রয়ে গেলেন। খুব কম আঁকতেন, ধীরে যত্ন নিয়ে আঁকতেন। শিষ্য বা পরম্পরা তৈরীর তত্ত্ব মানতেন না। ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক, মিতভাষী, অনাড়ম্বর, আত্মমুখিন, নির্জনতাপ্রিয় ও কোমল স্বভাবের। কিন্তু চরিত্রে ছিলেন দৃঢ়, প্রত্যয়ী, সমাজসচেতন এবং চিত্রকলাজ্ঞানে শক্তিশালী। জগৎজোড়া যখন তাঁর নামডাক তখনও জীবনের বেশীর ভাগটা কাটিয়ে দিলেন কবিরাজ রো-র প্রায়ান্ধকার গলিঘুঁজির মধ্যে ভাঙ্গাচোরা সাবেকি বাস্তুতে। তিনি ছিলেন 'সোসাইটি ফর কনটেম্পোরারি আর্টিস্টস্'-র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। যৌথ প্রদর্শনীতে জোর দিতেন। একক প্রদর্শনী প্রায় করতেনই না। নিজের স্বভাবসুলভভাবে নিঃশব্দেই চলে গেলেন কাব্যময় চিত্রকলার ধূসর জগতে।

চিনুয়া আচেবে
(১৯৩০ - ২০১৩)

দক্ষিণ-পূর্ব নাইজিরিয়ার ওগিদিতে জন্ম। বৃত্তি পেয়ে ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা। তারপর 'নাইজিরিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনে' চিত্রনাট্য লেখার কাজ নেওয়া। সেই সময়েই লেখেন বিখ্যাত উপন্যাস 'থিঙ্কস ফল এপার্ট' (১৯৫৮)। ঔপনিবেশিক নাইজিরিয়ায় এক ইগোবো যোদ্ধার ইতিকথা। এরপর চতুর্থ ও বিতর্কিত উপন্যাস 'এ ম্যান অফ দ্য পিপল' (১৯৬৬) লিখে সামরিক জনতার রোষানলে পড়েন। তারপর লেখেন 'দেয়ার ওয়াজ আ কানট্রি' (১৯৭০), 'অ্যান্টহিলস্ অফ সাভানা ' (১৯৮৭) উপন্যাসগুলি আফ্রিকাব বাস্তব সমস্যার উপর দাঁড়িয়ে মর্মস্পর্শী আবেদনশীল রচনাশৈলীতে। লেখেন 'ক্রিসমাস ইন বায়াফ্রা'র মত ঝকঝকে কবিতাগুচ্ছ অথবা 'অ্যান ইমেজ অফ আফ্রিকা : রেসিজম ইন কনরাডস্ হার্ট অফ ডার্কনেসে'র (১৯৭৫) মত বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ। নোবেল বিজয়িনী নাডিমে গাডিমার, গুগিয়া থঙ প্রমুখদের ছাপিয়ে তাঁকেই অভিহিত করা হতে থাকে আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে। 'কমনওয়েলথ পোয়েট্রি প্রাইজ', 'বুকার প্রাইজ', 'ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল' প্রভৃতি পুরস্কার পান। ১৯৯০-র এক পথ দুর্ঘটনায় চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য এবং সামরিক শাসনের রক্ত চক্ষু এড়াতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নেন। তাঁর মৃত্যুতে আফ্রিকান সাহিত্য পিতৃহারা হল।

বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী (১৯১১-২০১৩)

১৯৩০-র সেই ভারত কাঁপানো কয়েকটি দিন। শক্তিশালী ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের দম্ভে আঘাত করে মাষ্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারদের সুদক্ষ পরিচালনায় সাময়িক ভাবে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করে চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান ঘটে। মাস্টারদার 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মি'র সশস্ত্র তরুণ যোদ্ধারা একে একে অস্ত্রাগার, রেল স্টেশন, টেলিগ্রাফ অফিস, ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে ও স্বাধীন সরকার গঠন করে। পরে ব্রিটিশরা বড় সেনাবাহিনী নিয়ে এলে জালালাবাদ পাহাড়ে বীরত্ব ব্যঞ্জক লড়াই হয়। ঐ লড়াইয়ে কিশোর ছাত্র বিনোদ বিহারী গুলিবিদ্ধ হয়েও বেঁচে যান। তাঁকে দীর্ঘ সময় রাজস্থানে ব্রিটিশের জেলে পচতে হয়। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেন এবং দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্থানে থেকে যান। সেখানকার গণতান্ত্রিক ও ভাষা আন্দোলন ও পরবর্তিতে মুক্তি যুদ্ধে যোগ দেন। ১৯৭১ এ পাক সেনা - রাজাকারদের আক্রমণে গোপনে ভারতে এলেও দ্রুত স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। স্বাধীন বাংলাদেশ তাঁকে সম্মানিত করে। কিন্তু ১৯৭২ এ হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস শুরু হলে এর প্রতিবাদে ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বিবেক এবং কর্ণফুলি নদী ও সীতাকুণ্ড পাহাড়ের স্নেহচ্ছায়া মাখা চট্টগ্রাম শহরের অভিভাবক। ছাত্র পড়িয়ে অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে জীবনধারণ করতেন। শহীদ প্রীতিলতা যে স্কুলে পড়াতেন সেটি যখন ভেঙে ফেলার চেষ্টা হল ৯৯ বছর বয়সেও অনশনে নেতৃত্ব দেন। তাঁর মৃত্যুতে ব্রিটিশ ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টার শেষ সংযোগটি ছিন্ন হল, অবসান হল এক গৌরবময় অধ্যায়ের।

লতিকা সরকার (১৯২৩ -২০১৩)

বিশিষ্ট নারীবাদী নেত্রী। তিনি প্রথম দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ক্লাশ নেওয়ার সময় ধর্ষণ নিয়ে পড়ানো শুরু করেন। তিনি প্রথম কয়েক জন আইনবিদ সহকর্মীকে নিয়ে 'মথুরা' রায়ের বিরোধিতা করে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে ভারতের প্রধান বিচারপতিকে খোলা চিঠি লেখেন। তাঁরই চেষ্টায় পুলিশি ও জেল হেফাজতে ধর্ষণের বিষয়টি আইনিভাবে স্বীকৃত হয়। তিঁনি ছিলেন 'দিল্লী সেন্টার ফর উইমেনস্ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের' অন্যতম পুরোধা এবং 'কমিটি অন দ্য স্টেটাস্ অফ উইমেন ইন ইন্ডিয়া'র অন্যতম সদস্যা। তাঁর নেতৃত্বে আইনসভায় নারী সংরক্ষণ বিলের উপর একটি প্রয়োজনীয় সংশোধনি পেশ করা হয়। ভারতীয় নারী আন্দোলনকে তিনি আইনি কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠা করেন। বেশী বয়সেও প্রশাসন ও বিচার বিভাগের আক্রমণের তোয়াক্কা না করে ঋজুভাবে দাঁড়িয়ে 'আগ্রা প্রোটেকটিভ হোম' সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলা লড়ে অসহায় অনাথ নারীদের পরিবেশ পরিস্থিতির উন্নতির চেষ্টা করেন।

দীপঙ্কর চক্রবর্তী (১৯৪১ - ২০১৩)

দীপঙ্কর চক্রবর্তী চলে গেছেন। পেছনে রেখে গেছেন এক দীর্ঘ ইতিহাস। যে ইতিহাস পশ্চিমবাংলার গত পঞ্চাশ বছরের বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে, ফলিত মার্কসবাদের তাত্ত্বিক চর্চ্চার সঙ্গে, লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের সঙ্গে নানা ধরনের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও বিশেষ করে অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম -নেতাই -শাহবাগ সংহতি আন্দোলনের সঙ্গে সংপৃক্ত। শুধু সংপৃক্তই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই ,তাঁকে বাদ দিয়ে এই আন্দোলনগুলির ইতিহাস একেবারে অসম্পূর্ণই থাকবে। দীপঙ্কর চক্রবর্তীর জীবনালেখ্য তাই পশ্চিমবঙ্গের গত পঞ্চাশ বছরের বিপ্লবী আন্দোলনের, অধিকার আন্দোলনের, বহরমপুর শহর তথা মুর্শিদাবাদ জেলার লেলিহান ক্ষেতখামারের, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ও চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস। কবি, লেখক, সাংবাদিক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক, শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, মানবাধিকার কর্মী দীপঙ্কর চক্রবর্তীর জন্ম অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুরে। দেশভাগের পর পরিবারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুরে চলে আসেন। বহরমপুর ও কলকাতায় শিক্ষা। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক। 'মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ', 'পুনশ্চ' ও 'অনীক' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং 'পিপসল বুক সোসাইটি' (পি বি এস) প্রকাশনা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। এর মধ্যে খ্যাতিমান পত্রিকা 'অনীক' দীর্ঘদিন ধরে চলমান গণতান্ত্রিক, বাম ও বিপ্লবী আন্দোলনের মুক্তমনা বিশ্লেষণধর্মী তাত্ত্বিক আলোচনার এক অগ্রণী মঞ্চ হিসাবে কাজ করে চলেছে। তাঁর জনপ্রিয়তম অনুবাদগ্রন্থ চিন চিং মাইয়ের 'সঙ অফ ওয়াংহাই' অবলম্বনে 'বিপ্লবের গান'। তাঁর জোরালো প্রতিবাদী লেখনীর জন্য জরুরি অবস্থায় তাঁকে দীর্ঘ কারাবাসে কাটাতে হয়। তিনি ছিলেন বন্দী মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা এবং 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির (এ পি ডি আর)' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। নিজে কোন দলীয় বা গোষ্ঠী রাজনীতিতে যুক্ত না থেকে সব দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তি বাদীদের সঙ্গে নিয়ে একসাথে কাজ করানোর তাঁর ছিল বিরল দক্ষতা।

বীণা মজুমদার (১৯২৭ - ২০১৩)

একাধারে শিক্ষিকা, শিক্ষাবিদ, গবেষক, প্রশাসক, সংস্থা সংগঠক, চিন্তাবিদ, বক্তা, নারীবাদী আন্দোলনের নেত্রী। পারিবারিক কারণে কলকাতা, বেনারস, পাটনা, দিল্লী, শিমলা, বেহরামপুরে কাটাতে ও

পড়াশুনা চালাতে হয় এবং শেষে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। লতিকা সরকারের সঙ্গে 'কমিটি অন দ্য স্টেটাস অফ উইমেন ইন ইন্ডিয়া' কে পুনর্গঠন করা এবং সাড়া জাগানো প্রবন্ধ, 'টুয়ার্ড ইকোয়ালিটি' প্রকাশ তাঁর অন্যতম অবদান। তিনি পরিচিত সমাজসেবী সংস্থা 'মানুষী'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণনারী। পরে ICSSR -র 'সেন্টার ফর উইমেনস্ ডেভেলপমেন্ট' (CWDS) গঠন করে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর সহ বিভিন্ন জেলায় গ্রামীন মহিলাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করেন। ১৯৮০ ও ১৯৯০-র দশকে প্রতিটি পণ, হিংসা ও ধর্ষণ বিরোধী নারী আন্দোলনে তিনি পথে নেমে নেতৃত্ব দেন। তাঁর জনপ্রিয় আত্মজীবনীর নাম 'মেমোরিজ অফ এ রোলিং স্টোন।'

ইন্দ্রনাথ মজুমদার (১৯৩৩ - ২০১৩)

খুলনায় জন্ম, রংপুরে পড়াশুনা। ডানপিটে ছেলেটি নিজেই নিজের নাম মৃদুল পাল্টে হয়ে গেলেন শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র আইকনিক চরিত্র ইন্দ্রনাথ। দেশ ভাগের পর এপার বাংলায় চলে আসা। দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতিতে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করা এবং সেই সুবাদে ঘুরে বেড়ানো। তার সাথে ছিল বই পড়া, অন্যকে পড়ানো, পুরনো বই সংগ্রহ ও লাইব্রেরী তৈরীর নেশা। প্রবীর রায় চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে এই কারণে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। শেষ অবধি এই চরৈবতি বজায় রেখেছিলেন। ১৯৬০ এ কলকাতার বিধান ছাত্রাবাসের সুপারের দায়িত্ব নেন এবং অচিরেই সেটি হয়ে ওঠে দুস্থ মেধাবী ছাত্রদের আশ্রয়ের সাথে সাথে একটি সারস্বত চর্চ্চার কেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী অধ্যাপক থেকে জঙ্গী ছাত্রনেতা সকলেরই সেই সেরিব্রাল আড্ডায় বসার অবাধ অধিকার ছিল। ১৯৬১ তে ৯৩, হ্যারিসন রোডের দোতলায় খুললেন অভিনব পুরনো বইয়ের বিপণী। নামকরণ করলেন ছোটনাগপুরের সোনালী নদী সুবর্ণরেখাকে প্রতীক করে ঋত্বিক ঘটকের আইকনিক চলচ্চিত্র 'সুবর্ণরেখা'র নামে। বইয়ের গোয়েন্দাগিরি যেমন বেড়ে গেল তেমন তাঁর উপর গভীর পাঠকদের নির্ভরতাও বেড়ে গেল। আমর্ত্য সেন, অমিয় বাগচী, অশোক রুদ্র, অশোক মিত্র, নির্মল চন্দ্র, গৌতম ভদ্র, বন্ধুদের ছিল দীর্ঘ তালিকা। মজলিশি আড্ডা বসত শক্তি, সুনীল, বেলাল চৌধুরীদের নিয়ে। কমল কুমার মজুমদার, অনিল আচার্য্য, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়দের সম্পাদিত 'এক্ষণ' পত্রিকার তিনি ছিলেন প্রকাশক। সেই থেকে প্রতি বছর অল্প কিছু বই প্রকাশ করতেন। বলাই বাহুল্য সে সব বই বিষয়বস্তু, প্রচ্ছদ, অলঙ্করণ, মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের দিক দিয়ে হত অনুপম ও অভিনব। জরুরি অবস্থার সময় তাঁকেও কারাবরণ করতে হয়। ১৯৮৪তে শান্তিনিকেতনে 'সুবর্ণরেখার'র দ্বিতীয় বিপণী খুলে অচিরেই বিপুল জনপ্রিয়তা পান।

ডা: আবীর লাল মুখোপাধ্যায় (১৯২৭ - ২০১৩)

বিশিষ্ট ই এন টি শিক্ষক -চিকিৎসক। কলকাতা মেডিকেল কলেজ, এস এস কে এম প্রভৃতি হাসপাতালে বিভাগীয় প্রধান সহ বহু গুরু দায়িত্ব সামলেছেন। বিষয়ে দক্ষতা, কাজের প্রতি নিষ্ঠা এবং অমায়িক মধুর ব্যবহারে সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন। আজীবন ই এন টি বিষয়ে জনচেতনা প্রসারের এবং গরীব মানুষের সেবা করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। বিভিন্ন গণ উদ্যোগে তিনি নিরলস ছিলেন। জনস্বার্থে তথ্যচিত্র বানান এবং ছাত্র সহ জনসমাজকে সচেতন করতে কলম ধরেন। তাঁর একটি লেখা শিশুপাঠ্যে সংকলিত রয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক কাজে যুক্ত ছিলেন। যুক্ত ছিলেন 'অল ইন্ডিয়া ই এন টি অ্যাসোসিয়েশন', 'পিপলস্ রিলিফ কমিটি, 'সিনে সেন্ট্রাল' প্রভৃতি সংগঠনের সাথে। তাঁর শিক্ষক অনন্য সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষায় তৎপর ছিলেন। ১৯৯৫ সালে কলকাতা শহরের শেরিফের দায়িত্ব নেন। তাঁকে মানুষ বেশী করে মনে রাখবে শব্দ দূষণ বিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসাবে।

অজিত পান্ডে (১৯৩৯-২০১৩)

'রাতকে বিতায়লাম হো
দিনকে বিতায়লাম হো
তেবোও আমার মনের মানুষ আইলো না।
এ চাষনালা খনিতে
মরদ আমার ডুবে গেল গো....।'

চাষনালার খোলামুখ কয়লা খনিতে দুর্ঘটনায় বহু শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যুর পটভূমিকায় রচিত এই গণসঙ্গীত এক সময় মানুষের মুখে মুখে ফিরত। মুর্শিদাবাদের লাল গোলায় পদ্মাপাড়ে জন্ম অজিত পান্ডের অল্পবয়েসেই গানের হাতে খড়ি। তারপর কয়েক দশক ধরে কৃষক সংগ্রাম সহ বিভিন্ন গণসংগ্রামে অংশগ্রহণ, হাটে মাঠে ঘুড়ে বেড়ানো এবং গণসঙ্গীত গেয়ে চলা। তীব্র অর্থকষ্টের মধ্যেও গণসঙ্গীত গাওয়াকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা এবং সেক্ষেত্রেও কোন অর্থের দিকে না তাকিয়ে ('টাকা নেই ফান্ডে, গাইবেন অজিত পান্ডে')। অর্থসঙ্কটের জন্য কিছুদিন সিনেমা হলের লাইটম্যান ও কেশোরাম টেক্সটাইলসে শ্রমিকের কাজ করেন। অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। পরে পার্টি ভাগ হলে সি পি আই তে যোগ দেন। ষাটের দশকে দেশ জুড়ে তীব্র কৃষি সঙ্কটের মধ্যে বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ যখন তরাইয়ের প্রান্তিক গাঁয়ে আছড়ে পড়ে, আদিবাসী কৃষক রমণীরা শহীদ হলেন, তখন তিনি

নকশালবাড়ি আন্দোলনে যুক্ত হন। সেই সময়কার করা গানগুলির মধ্যে 'তরাই কান্দে রে' গানটি প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

'তরাই কান্দে গো, কান্দে আমার হিয়া
আর লাল তরাইয়ের মায় কান্দে
সপ্ত কন্যার লাগিয়া।...'

যথারীতি কারাবরণ করতে হয়। অবশেষে জরুরি অবস্থার স্বৈরাচারী তমসা কেটে গেলে তিনি আবার পথে ঘাটে উদাত্ত গলায় গান গাওয়া শুরু করেন। এই সময় একবার বিধায়ক হন। তিনি বাংলাদেশ ও ত্রিপুরাতে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখের কবিতায় সুরারোপ সহ জনপ্রিয় সঙ্গীতের উপর অনেক পরীক্ষামূলক ও সৃষ্টিশীল কাজ করে গেছেন।

ঋতুপর্ণ ঘোষ (১৯৬৩-২০১৩)

দীর্ঘ 'দহন' শেষে বৃষ্টি ভেজা শহরে চিরবিদায় নিলেন 'রেইন কোট' স্রষ্টা। থাকবেন না আর কোনও ছবির 'শুভ মহরৎ'-এ। ৩০ মে সকালে হৃদরোগে ঘুমের মধ্যে প্রযাত হলেন 'উনিশে এপ্রিল' ছবির পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ। রেখে গেলেন একগুচ্ছ ছবি। যা রয়ে যাবে 'আবহমান' কাল। ভারতীয় চলচ্চিত্রের শতবর্ষ উদযাপনের 'উৎসব'এই ইন্দ্রপতন। কলকাতায় জন্ম। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা। চিত্র পরিচালনার আগে বিজ্ঞাপনী চিত্রনাট্য রচনায় ও বিজ্ঞাপনের চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্যাপক সাফল্য লাভ। পরিচালক ঋতুপর্ণের আত্মপ্রকাশ ১৯৯৪এ 'হীরের আংটি' ছবি দিয়ে। প্রচন্ড সংবেদনশীল তার ছবির 'সব চরিত্র কাল্পনিক ' হলেও নাগরিক উচ্চ-মধ্যবিত্ত বাঙালী দর্শকের 'অন্তরমহল' ভাল বুঝতেন। মাত্র উনিশ বছরের পরিচালক জীবনে ইংরেজী 'লাষ্ট লিয়ার' ও হিন্দী 'রেইন কোট' সহ ১৯টি ছবি করেছেন যার মধ্যে 'বাড়িয়ালী', 'তিতলি', 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দুবার লোকর্নো উৎসবে সেরা ছবি সহ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ও প্রচুর জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। অভিনয় করেছিলেন 'আরেকটি প্রেমের গল্প' 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'মেমোরিজ ইন মার্চ' ছবিগুলিতে। তিনি কলকাতার তৃতীয় লিঙ্গদের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

অমর গোপাল বোস (১৯২৯ - ২০১৩)

দুনিয়ার তাবৎ বিদ্দজ্জন বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ কে ছাড়া আরেক বাঙালী বোসকে চেনেন। তিনি হলেন ধ্বনির জাদুকর অমর গোপাল বোস। সমস্ত বড় সংস্থা, ইনস্টিটিউট, হল, মিউজিয়াম, মার্কিন সেনাবাহিনী, নাসা, নামী মডেলের গাড়ি সর্বত্র চলে বোস ব্র্যাণ্ডের বোস কর্পোরেশনের অ্যাকোয়াস্টিকস্। পদার্থবিদ এবং ব্রিটিশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী ননী গোপাল বোস ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। পরে মুক্তি পেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে যান। সেখানে আর্থিক অনটনের মধ্যে নানারকম ব্যবসা করার চেষ্টা করেন এবং এক আমেরিকান শিক্ষিকাকে বিয়ে করেন। ১৯২৯ এ জন্ম অমর গোপাল বোসের। মেধাবী ছাত্র অধ্যয়নের পাশাপাশি রেডিও মেরামতি ও ইলেকট্রনিকসের ব্যবসা শুরু করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ননীগোপালের নারকেল ছোবরার গদী আমদানীর ব্যবসা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে তরুণ অমর গোপালকে সংসারের দায়িত্ব নিতে হয়। ছেলের প্রতি আত্মবিশ্বাসী ননীগোপাল অনেক টাকা ধার করে অমর গোপালকে ম্যাসাচুসেসটস্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে (MIT) ভর্তি করে দেন। সেখান থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংএ স্নাতক, মাষ্টারস্ ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। MITতেই অধ্যাপনা ও গবেষণায় যোগদান। প্রায় ৫০ বছরের গভীর সম্পর্ক MIT-র সাথে। পাশাপাশি ১৯৫৪ তে 'বোস কর্পোরেশনে'র সৃষ্টি। নিজস্ব গবেষণা, ব্যবসা ও সংস্থা চালানো। সাইকো অ্যাকোয়াস্টিকসকে কাজে লাগিয়ে উন্নত ধরনের সাউন্ড সিস্টেম ও স্পীকার তৈরী করেন। ১৯৬৮ তে তাদের তৈরী 'বোস ৯০১' মডেলটি প্রবল জনপ্রিয়তা পায়। তাঁর মৃত্যুতে ধ্বনিবিদ্যা গবেষণায় অপূরণীয় ক্ষতি হল।

- 'সারদা গ্রুপ' সহ আত্মসাৎ কারী বেআইনী অর্থলগ্নী সংস্থাগুলিকে বন্ধ; তাদের মদত দাতা ও চক্রী অসাধু মন্ত্রী-নেতা-আমলা-পুলিশ চক্রের কঠোর শাস্তি; এদের সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করে নিয়ে আমানতকারীদের মধ্যে বন্টন এবং পোষ্ট অফিস ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে সুদূর প্রসারী, সহজলভ্য ও শক্তিশালী করে তুলতে হবে।
- 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব', 'ব্রাইবিল', 'জি. এম. ও. চুক্তিচাষ' প্রভৃতি বৃহৎ পুঁজির চক্রান্ত গুলিকে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।
- মণিপুর সহ উত্তরপূর্বাঞ্চলে এবং 'আফস্পা', 'ইউ.এ.পি.এ' সহ সমস্ত কালা কানুন বাতিল করতে হবে। কাশ্মীরের গণধর্ষণ ও গুজরাটের দাঙ্গার সুষ্ঠ বিচার চালিয়ে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে।
- অমানবিক পরিবেশে 'রাণা প্লাজা' সহ গারমেন্টস্ 'SEZ' গুলিতে একের পর এক দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর প্রতিকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ও মৃত শ্রমিক পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
- চীনে তিব্বতী বৌদ্ধ ও উইগুর মুসলমানদের উপর, মায়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, শিখ, অহমেদিয়া, ফকির ও শিয়া সম্প্রদায়ের উপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে।
- সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে সিরিয়া, সুদান, লিবিয়া, কঙ্গোতে গৃহযুদ্ধ এবং ইজরায়েলের প্যালেস্তাইন ও লেবানন আক্রমণের বিরোধিতা করতে হবে।

স্মরণিকা

শেষ কথা ভালবাসা - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্যামল চক্রবর্তী

'আমার ভালবাসার কোনও জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না।' ভালবাসার হিরের গয়না পরে জন্মানো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন সেই কবে। সমবেত সৃষ্টির উল্লাসে আত্মহারা সুনীলের অমোঘ উচ্চারণ, 'শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম'। বেঁচে থাকাও শুধু যেন কবিতারই জন্য। হেলায় অমরত্ব প্রত্যাখ্যান করে ২৩ অক্টোবর ২০১২, মহাষষ্ঠীর মাঝরাতে কলকাতার 'পারিজাত' ছেড়ে সুনীল বেড়াতে গেলেন এক অলৌকিক চন্দনবনের অচেনা পথে।

জন্মেছিলেন ১৯৩৪ সালে, অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার মাজদিয়া গ্রামে। দেশভাগের দুঃস্বপ্ন আর শিকড় উপড়ানোর যন্ত্রণা। দরিদ্র পিতার সপরিবারে কলকাতায় চলে আসা। উত্তর কলকাতায় স্কুলমাস্টার বাবার সঙ্গে ছেলেমেয়ে ও মায়ের থামতে না জানা লড়াই। পেটে খিদের আগুন, বুকে কবিতার। কোনও বাধা থামাতে পারে নি সুনীলের কলমকে। পেটের টানে পদ্য থেকে গদ্যে। 'আত্মপ্রকাশ', 'একা এবং কয়েকজন', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'সেই সময়', 'পূর্ব পশ্চিম', 'প্রথম আলো' হয়ে 'অর্ধেক জীবন'।

শুধু কবিতা লিখে বাঁচতে চেয়েছিলেন গমগম করে। পারেন নি। গ্রাসাচ্ছদনের জন্য একদিন গদ্য লিখতে হয়েছে আঙুলে কড়া ফেলে। হারতে শেখেন নি। মধ্যবিত্ত সমাজের সুখ দুঃখ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, প্রেম অপ্রেমকে তুলে এনেছেন সাবলীল আটপৌরে গদ্যে। মাথা ঘামান নি সাহিত্যের সংজ্ঞা নিয়ে। শর্ত নিয়ে। মধ্যবিত্ত বাঙালি নিজেকে খুঁজে পেয়েছে তাঁর গল্পে, উপন্যাসে। মাঝেমধ্যে হিরের দ্যুতির মতা বেরিয়ে এসেছে অসাধারণ সব ছোটগল্প। 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প', 'শাজাহান ও তার নিজস্ব কাহিনী, 'সত্যের আড়ালে', 'দয়মন্তীর মুখ' ...।

কফিহাউস থেকে খালাসিটোলা, চাইবাসা থেকে হেসাডি, অরণ্য থেকে জনপদ — চষে বেড়িয়েছেন সদলবলে। সিগনেট খ্যাত ডি. কে. র সাহায্যে প্রকাশ করেছেন কবিতা পত্রিকা 'কৃত্তিবাস'। যে পত্রিকা আজও বিশ্বমানের। রক্ষণশীলতার খোলস ভেঙে শরীরী ভালবাসাকে নিয়ে এসেছেন লেখায়। বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে নিজের আদলে গড়ে নিয়েছেন অপাপবিদ্ধ যুবক 'নীললোহিত' কে। গড়ে তুলেছেন রহস্যে ঘেরা নিষ্পাপ অশরীরী 'নীরা'কে। 'নীরা, হারিয়ে যেও না', বলে উঠেছেন অস্ফুটে। পাশাপাশি সাংবাদিকতা, দেশবিদেশ ভ্রমণ। অকল্পনীয় পড়াশোনা। আশ্চর্য এক দার্শনিক। অবিরাম অন্বেষণ। চোখ সবদিকে। ক্রাচে ভর দিয়ে একজন মানুষকে পাহাড়ে চড়তে দেখে বানিয়েছেন 'কাকাবাবু' রাজা রায় চৌধুরীকে। কাকাবাবুকে অ্যাডভেঞ্চারে বুঁদ হয়েছে বাচ্চা থেকে বুড়ো, সব্বাই।

খ্যাতির শীর্ষে থেকেও তরুণ লেখকদের প্রেরণা অবিরত। প্রতিভার খোঁজ পেলেই তা উস্কে দেওয়া। কত কবি, কত লেখক যে তৈরি করেছেন প্রেরণার অমোঘ স্পর্শে! সবার জন্য আদিগন্ত ভালবাসা। অন্য মতে আশ্চর্য সহিষ্ণুতা নিন্দা, অপবাদ, কুৎসা, সমালোচনাকে হেলায় অগ্রাহ্য করা। অনুশীলন আর জন্মগত প্রতিভার মেলবন্ধনে নিজেই হয়ে উঠেছেন এক প্রতিষ্ঠান। জনপ্রিয়। বিতর্কিত। প্রসন্ন। উদার। অভিমানী।

ভারতীয় সাহিত্য একাডেমির সভাপতির পদে থেকেই চলে গেলেন রাজার মতো। অবসান হল বাংলা সাহিত্যের এক বর্ণময় যুগের। শুধু কলমের দাপটে আর ভালবাসার জাদুতে জয় করেছেন বাঙালির মানসলোক। ঘুরে বেড়িয়েছেন 'স্বর্গ থেকে ধুলোর মর্তে'। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গিয়ে ভাঙতে চেয়েছেন প্রতিষ্ঠানকে। পারেন নি। রুখে দিতে চেয়েছেন হাজার প্রতিভার অঙ্কুরে অপমৃত্যু। পেরেছেন। বাংলা সাহিত্যের অনেক অনেক ঋণ রয়ে গেল তাঁর কাছে।

অস্বীকার করতে চাইলেন অমরত্ব। পারলেন না। চিতার আগুনে দাউ দাউ পুড়ে ছাই হয় মানুষ। পোড়ে না ভালবাসার হিরে। উজ্জ্বল, বর্ণময় হয়ে ওঠে আরও। 'পারিজাত' ছেড়ে চলে গিয়েও সুনীল পারলেন না আমাদের ছেড়ে পালাতে। রয়ে গেলেন মৃত্যুহীন। অনেক অনেকদিন বাদে বাংলা সাহিত্য পড়তে পড়তে কোনও তন্নিষ্ঠ পাঠক হয়তো থমকে যাবেন। মনে মনে বলে উঠবেন, 'সে অনেক বদলে গেছে, সে আর আগের মতো নেই'!

ডা: লক্ষ্মী স্বামীনাথন

"কদম কদম বাড়ায়ে যা ..." দেশবাসীর মুক্তির সংগ্রামের জন্য যে কজন মহীয়সী বীরাঙ্গনা নারীকে ভারতবাসী চিরকাল মনে রাখবে তাঁদের অন্যতম ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন। মাদ্রাজের এক সম্ভ্রান্ত মালয়ালী পরিবারে জন্ম ১৯১৪ তে। প্রথমে এম.বি.বি.এস. তারপর স্ত্রীরোগে ডিপ্লোমা। সরকারী হাসপাতালে কাজের পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজে জড়িয়ে পড়া। এর পর সিঙ্গাপুরে গমন। সেখানে গরীব মানুষের জন্য ক্লিনিক খুলে চিকিৎসা এবং 'ইন্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেনস লীগে'র সাথে জড়িয়ে পড়া। সেখানেই বিপ্লবী রাসবিহারী বসু কর্তৃক গড়ে তোলা জাপানীদের

হাতে বন্দী ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর জাতীয়তাবাদী ভারতীয় সেনাদের 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' (আই. এন. এ)'-র সাথে যোগাযোগ। ১৯৪৩-এ নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু জার্মানী থেকে সিঙ্গাপুর আসার পর 'আই.এন.এ.'-র তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। নেতাজী রাণী লক্ষ্মী বাঈয়ের নামে একটি মহিলা রেজিমেন্ট গড়ে তোলেন এবং পুরোদস্তুর সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে তার দায়িত্ব নেন ক্যাপ্টেন ডা: লক্ষ্মী স্বামীনাথন। তারপর বারমা ফ্রন্টে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এক অসম সাহসী যুদ্ধ। দিল্লী না পৌঁছতে পারলেও মণিপুরের মাইরাংয়ে 'আই.এন.এ.' প্রবেশ করে। পরে পরাজিত জাপানের অসহযোগিতা, সরবরাহ ফুরিয়ে যাওয়া, কষ্টকর জঙ্গল জীবন ও ব্রিটিশের প্রবল আক্রমণে 'আই.এন.এ.' পিছু হটে। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী ধরা পড়েন ও বিচার চলে। পরে তিনি 'আই.এন.এ.-র প্রাক্তন কর্ণেল প্রেম কুমার সেহগালকে লাহোরে বিয়ে করেন। কানপুরে বসবাস শুরু করেন। স্বাধীনতার পর লক্ষ্মী সেহগাল কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। আমৃত্যু দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে এবং সমাজসেবা ও মহিলা মুক্তির কাজে যুক্ত থাকেন। তাঁর কন্যা রাজনৈতিক নেত্রী সুহাসিনী আলি।

এরিক হবসবম

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও সমাজ গবেষক এরিক হবসবমের প্রয়াণ হল। দীর্ঘায়ু হবসবম শুধু গূঢ় গবেষণা নয় স্বচক্ষে দুটি বিশ্বযুদ্ধসহ বহু ইতিহাসের সাক্ষ থেকেছেন — বাল্যে মিশরে, কৈশোরে জার্মানী, কলেজ ছাত্রাবস্থায় ইংল্যান্ডে। তাঁর বিদগ্ধ রচনাগুলির মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত চারটি জ্ঞান কোষ— 'দ্য এজ অফ রেভেলিউশন ইন ইউরোপ (১৭৮৯ - ১৮৪৮)', 'দ্য এজ অফ ক্যাপিটাল (১৮৪৮ - ১৮৭৫)', 'দ্য এজ অফ এম্পায়ার (১৮৭৫ - ১৯১৪.) এবং 'দ্য এজ অফ এক্সট্রিমস : দ্য শর্ট টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি (১৯১৪ - ১৯৯১)'।

ড: ভার্গিজ কুরিয়েন

সমবায় মানে লোকসান বা খুঁড়িয়ে চলা ধারণাটিই আমূল বদলে দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত 'আমূল' ব্র্যাণ্ড নামের দুগ্ধজাত সামগ্রীর এবং ভারতের সফল 'হোয়াইট রেভেলিউশনে'র যিনি উদ্গাতা সেই জনপ্রিয় 'মিল্কম্যান' ভার্গিজ কুরিয়েন চলে গেলেন। ১৯২১ সালে কেরলের কোঝিকোড়ে জন্ম, চেন্নাই থেকে বিজ্ঞান স্নাতক, তারপর জামসেদপুরে 'টিস্কো'য় চাকরির পর স্কলারশিপ নিয়ে ব্যঙ্গালুরুতে ডেয়ারি ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশুনা। তারপর যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে গুজরাটের আনন্দে একটি সরকারি দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় চাকরি। পার্শ্ববর্তী 'কাইরা জেলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায়ে'র স্থিতাবস্থা কাটাতে যোগদান এবং বিশাল স্বপ্ন, আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রবল কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে এক মডেল দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে পরিণত করা। ক্রমে সমবায় ও উৎপাদনের বিশাল ব্যাপ্তি। 'আনন্দ মিল্ক ইউনিয়ন লিমিটেড' বা 'আমূলে'র যাত্রা শুরু। অচিরেই কোন সরকারী সহায়তা ছাড়া গ্রামীণ দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের উদ্যোগের উপর নির্ভর করে দক্ষ. পরিচালনায় ব্যাপক পরিমাণ দুধ উৎপাদন ও সংগ্রহ, গুণমান ও স্বাদ থেকে উৎপাদনের বৈচিত্র্য সহ বিপণন ও বিজ্ঞাপনে ইতিহাস সৃষ্টি। ভারতের ঘরে ঘরে 'আমূলে'র স্থায়ী প্রবেশ। কুরিয়েন ও 'আমূল' তারপর থেকে এগিয়েই গেছে। বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন, পেয়েছেন বহু পুরস্কার। 'ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (এন.ডি. ডি.বি.)-র চেয়ারম্যান ছিলেন। ছিলেন সত্তর দশকের 'অপারেশন ফ্লাড' কর্মসূচীর প্রাণপুরুষ।

ডা: মৃণাল গোরে

তখনও মুম্বাইয়ে আম্বানী - বাল থাকরে - শরদ পাওয়ার - দাউদ ইব্রাহিমদের বৃহৎ পুঁজি - অসাধু ব্যবসায়ী - দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিক - মাফিয়া অপরাধীদের দুষ্ট চক্র গেড়ে বসেনি। মুম্বাই ছিল কারখানা, শ্রমিক, মধ্যবিত্তের এক উদীয়মান ঘন জনবসতি। সি.পি.আইয়ের তারা রেড্ডি, সি.পি.এমের অহল্যা রঙ্গনেকার এবং সোসালিষ্ট পার্টির মৃণাল গোরে তিন জন নেত্রী তখন মুম্বাই তথা মহারাষ্ট্রের আকাশে দীপ্যমান। তারও আগে পশ্চিম গোঁরেগাওয়ের এই জনপ্রিয় সমাজকর্মী পাণীয় জল নিয়ে দুরন্ত আন্দোলন করে এবং দ্রব্যমূল্যবিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে সকলের প্রিয় মৃণালতাই বা 'পানিওয়ালি বাই' নামে পরিচিত হয়ে গেছেন। ১৯২৮-এ জন্ম। চিকিৎসকের কেরিয়ার ছেড়ে 'রাষ্ট্র সেবা দলে' যোগ দিয়ে সমাজসেবা শুরু। পরে সোসালিষ্ট পার্টিতে যোগদান, সমাজসেবী কেশব গোরের সাথে অন্য জাতের মৃণাল মোহাইলের বিয়ে। কেশভের মৃত্যুর পর 'কেশব গোরে স্মারক ট্রাষ্ট' গড়ে সমাজ সেবা চালিয়ে যান। তার সাথে চলতে থাকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। ১৯৬১ তে প্রথমবার বম্বে কর্পোরেশনের কর্পোরেটর, ১৯৭২-এ প্রথমবার মহারাষ্ট্র বিধানসভার সদস্য এবং ১৯৮৫-তে জনতা দলের হয়ে প্রথমবার লোকসভার সদস্য। তাঁর অনেক কাজের মধ্যে ভ্রূণ - লিঙ্গ নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সওয়াল করে আইন পাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে' তিনি সক্রিয় সহায়তা করেন। 'স্বআধার' সংস্থা গড়ে তুলে হিংসার বলী মহিলাদের পুনর্বাসনের কাজ করতেন। জরুরী অবস্থায় তিনি কারাবরণ করেন।

ডা: সক্রেটিস

সারা পৃথিবী এই শ্মশ্রুশোভিত মেদহীন দীর্ঘ অ্যাথলিটকে তাঁর জাদু ফুটবলের জন্য জানে। উদাসী অথচ ভয়ঙ্কর এবং সারা মাঠ জুড়ে খেলা মিউফিল্ডার ছিলেন পেলে - গ্যারিঞ্চা - জর্জিনো - রিভেলিনো - টোস্টাওদের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল দলের পরবর্তীতে জিকো - জুনিয়র - ফালকাওদের নিয়ে গড়া শ্রেষ্ঠ ব্রাজিল ফুটবল দলের প্রধান স্তম্ভ এবং অধিনায়ক। দু'দুটি বিশ্বকাপ খেলে দুর্ভাগ্যের জন্য কাপ জেতেননি কিন্তু আবিশ্ব ফুটবলমোদীদের মন মাতিয়েছেন। ডা: সক্রেটিস এছাড়াও ছিলেন একজন দার্শনিক, লেখক, সাংবাদিক, ধারাভাষ্যকার এবং মননশীল শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি ব্রাজিলিয় লীগে খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্লাব প্রশাসন সৃষ্ট বিভাজনের অবসান ঘটিয়েছিলেন। ব্রাজিলের মানুষ তাঁকে আরও মনে রাখবে দীর্ঘ অত্যাচারী সামরিক জনতা শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের একজন নেতা ও সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী হিসাবে।

ড: পিয়ের সঁলে

আলজিরিয়াজাত ক্যাথলিক বাবা-মার সন্তান পিয়ের সঁলে ১৯৩০-এ আলজিয়ার্সে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি উপনিবেশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৫৪-র আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত থাকার দায়ে তাঁর জেল হয় এবং তারপর দেশ থেকে বিতাড়িত হন। প্যারিস থেকে মেডিসিনে ডক্টরাল সম্পূর্ণ করে টিউনিসিয়ায় চলে গিয়ে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হন। ১৯৬২-তে আলজিরিয়া ফরাসী শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে এবং ১৯৬৩-তে সঁলেকে আলজিরিয়ার নাগরিকত্ব দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। তারপর সঁলে আলজিয়ার্সের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সহ সাংসদ ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রধান দায়িত্ব পালন করে চলেন। এর সাথে সাথে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিবিধ জনস্বাস্থ্য কর্মসূচীতে বিশেষ করে যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচীতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে দেশের অভ্যন্তরে একদিকে স্বৈরশাহীর অত্যাচার অন্যদিকে ওয়াহাবি গোঁড়া মোল্লাতন্ত্রের ও উগ্রপন্থার উত্থানে ১৯৯৪-তে তাঁকে আবার আলজিরিয়া থেকে বিতাড়িত হতে হয়। এরপর তিনি আফ্রিকা, মধ্য-প্রাচ্য ও এশিয় দেশগুলিতে জনস্বাস্থ্য সমস্যা বিশেষ করে যক্ষ্মার সমস্যা নিয়ে কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যক্ষ্মা নিরাময়ের আধুনিক 'ডটস্' চিকিৎসা এবং জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীগুলির তিনি অন্যতম প্রণেতা ও পৃষ্ঠপোষক। পেয়েছেন প্রচুর আন্তর্জাতিক সম্মান। তাঁর কাজের ছিল বিশাল ব্যাপ্তি। শেষ বয়সে তিনি যে মেমোয়ারটি লিখেছেন তাঁর নাম ছিল 'মেডিসিনের সাথে পঞ্চাশ বছর'। জনস্বাস্থ্যের এই দিকপাল ব্যক্তিত্ব ৯ অক্টোবর ২০১২ তে আলজিয়ার্সে পরলোকগমন করেন।

সুনীল জানা

আলোকচিত্র - সাংবাদিকতাকে ভারতীয় সংবাদ, পত্রিকা ও সংস্কৃতি জগতে প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন পর্যায়ে আলাকচিত্র - সাংবাদিকতাকে আরও উন্নত ও আকর্ষণীয় করে তোলা আলোকচিত্র-শিল্পী সুনীল জানার সবচাইতে বড় অবদান। ১৯১৮-তে অসমে উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম, ছাত্রাবস্থায় বাম ছাত্র রাজনীতিতে ও পরে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান। ১৯৪৩-র ভয়ানক মন্বন্তরের সময় আকালের সন্ধানে ক্যামেরা হাতে পার্টির সাধারণ সম্পাদক পূরণ চাঁদ যোশির সঙ্গে দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামগুলিতে ঘুরে বেড়ানো, মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশা চাক্ষুস করা এবং ক্যামেরায় ভাস্বর করে রাখা। এই চিত্রগুলি যখন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ হতে থাকল বিদেশে সোরগোল পড়ে গেল। এর ফলে তাঁর প্রচুর পুরস্কার ও সম্মান প্রাপ্তি হল। জানার যাত্রা শুরু হল। বম্বেকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এবং বরেণ্য ব্যক্তিত্ব থেকে সাধারণ মানুষের অসাধারণ সব শট্ তুলতে লাগলেন। ১৯৪৫-এ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক মার্গারেট বুকে হোয়াইটের আমন্ত্রণে বেশ কিছু বিশ্বমানের যৌথ কাজ করেন। এরপর এল যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ। তাঁর জীবনেও চরম ধাক্কা এল। প্রথমে প্রিয় পার্টি ভাগ হল, পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হলেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে তাঁর প্রতিভা ব্যক্তিমুখী সৃজনে মগ্ন হল। সেইসময় তাঁর বিষয় ছিল রাজনৈতিক ঘটনাবলী, রাজনৈতিক ও অন্যান্য স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, ভারতীয় স্থাপত্য ও স্মারক চিহ্ন, ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য, ভারতে শিল্পায়ণ প্রচেষ্টা ইত্যাদি। তাঁর কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি হিসাবে দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার সহ প্রচুর পুরস্কার লাভ করেন।

শান্তিগোপাল

এই প্রজন্ম দেশভাগ-দাঙ্গা-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেনি, দেখেনি বাংলাদেশ যুদ্ধ- নকশাল আন্দোলন। মোকাবিলা করতে হয়নি স্বৈরশাসন ও জরুরি অবস্থা। সে সময়টা ছিল ভয়ঙ্কর। সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন স্তরের যে সংগ্রাম আবার গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছিল তার মধ্যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও রেখেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। নাটকে বাদল সরকার ও উৎপল দত্ত। গানে ভূপেন হাজারিকা এবং যাত্রায় শান্তিগোপাল কয়েকটি অবিস্মরণীয়

নাম। শান্তিগোপালের যাত্রা দেখতে তখন হাজার হাজার মানুষ পাগলের মত ছুটত। কখনও তিনি হিটলার, কখনও কার্ল মার্কস, কখনও বা লেনিন, মাও সে তুঙ, হো-চি-মিন, সুভাষ বা বিবেকানন্দ। তাঁর অননুকরণীয় যাত্রাভিনয় মানুষের হৃদয়কে ছুঁয়ে যেত, তিনি ছড়াতেন সামাজিক সচেতনতা। জন্ম ১৯৩৪। পিতৃদত্ত নাম বীরেন্দ্র নাথ পাল। গ্রুপ থিয়েটারে নাটক, শেকস্‌পীয়র চর্চার পর তিনি যাত্রায় আসেন। 'নান্দীকার' ও 'নট্ট কোম্পানী'র মত নামী থিয়েটার ও যাত্রা দলে ছিলেন। ষাটের দশকে নিজে 'তরুণ অপেরা' গড়ে তুলে যাত্রা শুরু করেন ও অচিরেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছন। তাঁর উপস্থাপনা বিরুদ্ধবাদীদের হামলার মুখেও পড়ে। চারদিক খোলা মঞ্চ, মাইক্রোফোন, ফ্লাড লাইট, আলোয় ফিল্টার, টেপ রেকর্ডারে আবহ প্রভৃতি আধুনিকতা তিনি যাত্রা মঞ্চে প্রথম প্রবর্তন করেন। 'সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহরু পুরস্কার' সহ বহু পুরস্কার পেয়েছেন।

ডা: মৌসুমী ভট্টাচার্য্য

আশির দশকের শুরুতে মূলত ন্যাশনাল ও নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের এক ঝাঁক উজ্জ্বল মেডিকেল ছাত্রছাত্রী সমাজ সেবামূলক কাজে ব্রতী হন। তারা 'ক্যালকাটা ন্যাশনাল ওয়েলফেয়ার অরগানাইজেশন (সি.এন.ডব্লিউ.ও.)' স্বাস্থ্য সংগঠনের সাথে গ্রামের দরিদ্রপীড়িত কৃষিজীবীর কুটির থেকে শহর - শিল্পাঞ্চলের বস্তী ও শ্রমিক মহল্লাগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সহায়তা দিতেন, পাশাপাশি হাতে কলমে বাস্তব অবস্থা ও জীবন থেকে শিখে নিজেদের সমৃদ্ধ করতেন। বন্যা, সাইক্লোন, যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মনুষ্যসৃষ্ট দাঙ্গা সর্বত্র তারা ছুটে যেতেন। বসিরহাটের বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে হুগলীর কৃষিজীবী গ্রাম, নৈহাটির জুটমিল থেকে অসমের নেলি। সেইসময় বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে হাসপাতালগুলিতে যে জুনিয়ার ডাক্তার-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাতেও অনেকে সহযোগী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই সেবাব্রতী মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সবচাইতে উজ্জ্বল ছিলেন মৌসুমী। পরবর্তীতে ব্যস্ততা, প্রশাসনিক চাপ, অ্যাকাডেমিক, নেতৃত্বের বিভ্রান্তি, দক্ষতা ও উদ্যোগের অভাব এবং 'সি.এন.ডব্লিউ.ও.' থেকে 'পিপলস্ হেলথ্' গড়ে ওঠার ঘাত-প্রতিঘাত বিতর্কে অনেক জটিলতা ও দূরত্ব তৈরি হয়। কিন্তু এসবের মধ্যে মৌসুমীরা কয়েকজন অবিচলভাবে অনেকদিন ধরে টালিগঞ্জের ঝালদার মাঠ রেল বস্তী, কালীঘাট- চেতলার বস্তীর চিকিৎসা কেন্দ্র এবং গ্রামাঞ্চলের মেডিকেল ক্যাম্পগুলিতে পরিষেবা দিয়ে যান। মৌসুমী 'অ্যানাসথেসিওলজি' নিয়ে উচ্চ শিক্ষালাভ করেন। তারপর চাকরি ও সাংসারিক বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মৌসুমী ছিলেন অত্যন্ত ইতিবাচক ও দৃঢ় মানসিকতার অধিকারীণী। ছেলেমেয়ের নাম রেখেছিলেন রোদ্দুর আর বৃষ্টি। সম্প্রতি নতুন উদ্যোগের সাথে মৌসুমী যোগযোগ গড়ে তোলেন। তারপর হঠাৎই আমাদের হতবাক করে চলে যান। মৃত্যুর সময় কলকাতার শম্ভু নাথ পণ্ডিত হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। ২০১০-এ শ্রী হারাধন চট্টোপাধ্যায়, ২০১১-এ শ্রী হরিপদ দাস এবং ২০১২-এ ডা: মৌসুমী ভট্টাচার্য্য - তিনজন অসামান্য স্বাস্থ্য সংগঠক ও কর্মীকে আমরা হারালাম।

পণ্ডিত রবিশঙ্কর

অস্তাচলে গেলেন রবি, সেতারের মধ্যমণি পঞ্চম তারটি ছিঁড়ে গেল। আঙুর পাতা ছাপ সুন্দরী ১৩ তরফের সাত তারের রুদ্রবীণাসদৃশ সরোদ অঙ্গের সুরবাহারের মন্দ্র ধ্বণির সেই অলৌকিক সেতার। যার ঐশ্বরিক সুরমূর্চ্ছনা ও লহরীতে পৃথিবী মন্ত্রমুগ্ধ থাকত। যার বলিষ্ঠ অথচ মিঠে সুর, স্বর ও তালে ঘুচে গিয়েছিল যুগ যুগান্তরের ঘরাণাবিভক্ত জাতপাত, রসস্নাত হতেন সব ধরনের শ্রোতা। হিন্দুস্তানী মার্গ সঙ্গীতের ধ্রুপদী বিশুদ্ধতা, ঘরানা, তালিম, রেওয়াজ, শৃঙ্খলা ও বাজনাকে অক্ষুন্ন রেখেই সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে যার সুরধ্বনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের দ্যুতিকে নিয়ে এসেছিল প্রাচ্য সঙ্গীতের রত্নভান্ডারের বাহুডোরে। যার সদাস্থিত হাস্যময় শোভনসুন্দর প্রাতিভাধর বিশ্বনাগরিক বর্ণময় চরিত্রের বাদক পণ্ডিত রবিশঙ্করের (রবীন্দ্রশঙ্কর হর চৌধুরী) প্রয়াণে আট দশকের একটি বৈচিত্র ও সৃষ্টিতে ভরা যুগের অবসান হল।

যশোরের নড়াইলের আদিনিবাসী রাজস্থানের ঝালওয়ার রাজ্যের দেওয়ান ব্যারিষ্টার সংস্কৃত পণ্ডিত ও ভূপর্যটক শ্যামশঙ্কর চৌধুরীর সপ্তম পুত্রের কনিষ্ঠ রবিশঙ্কর ১৯২০ তে জন্মগ্রহণ করেন। বালক রবিশঙ্করের জীবনের প্রথম দশ বছর কাটে উত্তরপ্রদেশের বারাণসী শহরের তিলিভাণ্ডেশ্বরের গলিতে মাতুলালয়ে। এরপর ১৯৩০-এ মাতা হেমাঙ্গিনী দেবী ও অন্য তিন ভ্রাতার সাথে ফ্রান্সের প্যারিসে বিশ্বজয়ী নৃত্যশিল্পী তাঁর পিতৃতুল্য বড়দা উদয়শঙ্করের কাছে চলে যান এবং উদয় শঙ্করের নৃত্যদলে যোগ দেন। উদয়শঙ্করের দল তখন ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা মাতিয়ে রেখেছে। সেই দলে সবরকম সহায়তার পাশাপাশি রবিশঙ্কর দক্ষতার সাথে নৃত্য ও অভিনয় করতেন। সেখানেই হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও বাজনা এবং পাশ্চাত্যের সঙ্গীত ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয়। ১৯৩৫-এ সেনিয়া ঘরানার দিকপাল বাদক ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ পুত্র আলি আকবরকে নিয়ে উদয় শঙ্করের দলে যোগ দেন।

ইতিমধ্যে জীবনের পথ বেছে নিয়ে রবিশঙ্কর ১৯৩৭-এ মধ্যপ্রদেশের মাইহারে গিয়ে বাবা আলাউদ্দীনের কাছে নাড়া বেঁধে কঠোর সাধনায় সাত বছর ধরে সেতার বাজানো শেখেন। এখানে আলাউদ্দীন কন্যা অসাধারণ সরোদিয়া ও সুরবাহার বাদক রোশেনারা বা অন্নপূর্ণা দেবীর সাথে ১৯৪১-এ বিবাহ ও ১৯৪২-এ পুত্র শুভেন্দু শঙ্করের জন্ম। ১৯৩৭-এ এলাহাবাদ

সঙ্গীত সম্মেলনের মঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশ, পরে শিক্ষা শেষে বাবা আলাউদ্দীনের অনুমতি নিয়ে তিনি ও আলি আকবর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাজাতে শুরু করেন এবং অচিরেই খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে যান। এরপর ৪০-র থেকে শুরু হয় তাঁর সৃষ্টির স্বর্ণযুগ। প্রথমে আলমোড়াতে তৈরী উদয়শঙ্করের 'ভারতীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র' ('সামান্য ক্ষতি'...), তারপর 'ত্রিবেণী কলাসঙ্গম ('মেলোডি অফ রিদম্'...), 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ' ('স্পিরিট অফ ইণ্ডিয়া', 'ইণ্ডিয়া ইমর্টাল', 'সাঁরে যাহা যে আচ্ছা'-র সুরারোপ, 'ধরতি কে লাল' ও 'নীচা নগরে'র সঙ্গীত পরিচালনা...), 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার' ('ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া...), 'ড্যান্সারস এসোসিয়েশন' (চণ্ডালিকা') — অনেকগুলি মাষ্টার পীস কম্পোজ করেন। ৪০ ও ৫০-র দশকে দীর্ঘসময় 'আকাশবাণী'র বাদ্য পরিচালক হিসাবে দুর্দান্ত সব সুর ও পীস কম্পোজ করেন। নিজে আবিষ্কার করেন ৩০টির বেশী রাগ। সত্যজিৎ রায়ের 'অপু ট্রিলজি' ও 'পরশপাথর', তপন সিংহের 'কাবুলিওয়ালা' ছাড়াও 'গোদান', 'অনুরাধা', 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড', 'গান্ধী' প্রভৃতি ফিল্মের সঙ্গীত পরিচালনা করেন। পরে ৭০-র দশকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধীর অনুরোধে 'দূরদর্শন' ও 'দিল্লী এশিয়াডে'র সুরসূচনা রচনা করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ১৯৭১-এ ন্যু ইয়র্কে যে বিশাল কনসার্ট হয় তার উদ্যোক্তা ছিলেন জর্জ হ্যারিসন ও রবিশঙ্কর।

৫০-র দশক থেকেই রবিশঙ্কর বিদেশে যাওয়া এবং সেখানকার বিভিন্ন কনসার্টে বাজানো শুরু করেন। অচিরেই সেতারের সুরেলা মায়াজালে বিশ্বের হৃদয় জয় করে নেন। তাঁর বাজনায় ছিল বিস্তার, গতকারি ও তানের সুঠাম বুনোট, তাল লয় ও ছন্দের চমৎকার সমন্বয় এবং এক সার্বিক ভারসাম্য। তাঁর প্রতিটি অনুষ্ঠানে পাওয়া যেত ধ্রুপদের আলাপ, খেয়ালের জোড়, দক্ষিণী সঙ্গীতের গমক ও গৎকারি, ঝালার চমক, ঠুমরির মিষ্টতা এবং রাগমালা ও লোকধুনের সুক্ষ্ম কাজের এক অনাবিল মেলবন্ধন। তাঁর প্রিয় কর্ণাটকী সঙ্গীতের গাণিতিক পরিমিতির মত তার ছিল বাদন ও পরিবেশের উপর প্রচণ্ড নিয়ন্ত্রণ। এর সাথে মঞ্চসজ্জা, আলো, স্বরধ্বনি প্রক্ষালন কৌশল এবং শ্রোতাদের দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে অসম্ভব দখল। ধারাবাহিকভাবে দেশ বিদেশের সমস্ত বড় মঞ্চেই তিনি বাজিয়ে মানুষকে আনন্দ দিয়ে গেছেন। এমনকি মন্টেরি, উডস্টক প্রভৃতি বিখ্যাত পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মঞ্চে ভারতীয় যন্ত্রের জাদুতে মাত করে দিয়েছেন পপ, জ্যাজ, হিপি প্রজন্মকেও। মেনুহিন, রামফল প্রমুখ বিশ্বশ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টাদের সাথে যৌথ কাজ করেছেন। 'বিটলস্' খ্যাত হ্যারিসন, প্রসিদ্ধ জ্যাজশিল্পী কোলট্রেন প্রমুখরা গ্রহণ করেছেন শিষ্যত্ব। রাজ্যসভার সদস্য, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, ভারতরত্ন সহ দেশের সর্বোচ্চ সমস্ত সম্মান পেয়েছেন। চারবার গ্র্যামি সহ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, ফিলিপাইনস সহ বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ সম্মান সহ অস্যাংখ্য পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছেন।

এত সবের পরেও তিনি ছিলেন শিল্প ও শিল্পের শুদ্ধতা রক্ষায় অটল, শিল্প সাধনায় ও শিল্পের উন্নতিতে এক ধ্যানমগ্ন সাধক। আমৃত্যু নিষ্ঠার সাথে রেওয়াজ চালিয়ে গেছেন। সঙ্গীতের যা কিছু ভাল গ্রহণ করেছেন এবং সুন্দরভাবে শ্রোতাদের উপহার দিয়ে গেছেন। তিনিই প্রথম তবলা ও অন্যান্য সহযোগী শিল্পীদের সামনের সারিতে নিয়ে আসেন এবং নতুন শিল্পীদেরও যে কোন ভাল শৈল্পিক কাজে উৎসাহ দিতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করলেও শিকড়কে ভুলে যান নি। নিয়মিত দেশে আসতেন। তিনি ছিলেন আধুনিক মনস্ক আদ্যোপান্ত বাঙালী। ব্যক্তি জীবনকে শিল্পীসত্ত্বা থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং গত নভেম্বর মাস অবধি নিয়মিত স্টেজ পারফরমেন্স করে গেছেন। বারাণসীর গঙ্গা থেকে লস অ্যাঞ্জেলসের প্রশান্ত মহাসাগরের সুর-সাগর সঙ্গমে তাঁর দীর্ঘ ৯২ বছরের যাত্রার পরিসমাপ্তি হল।

— নিবেদনে : অরণি সেন।

- অর্থ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে এক শ্রেণির চিকিৎসক এবং ড্রাগ কন্ট্রোলার এক শ্রেণির কর্তার সঙ্গে যোগসাজস করে বিভিন্ন ওষুধ সংস্থা বাজারে নিষিদ্ধ ওষুধ ছড়িয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ তুলল 'ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম (DAF)'।
- 'ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া' ঘোষিত তথ্য অনুযায়ী ২০০৭-২০১১ এই চার বছরে ড্রাগের ক্লিনিকাল ট্রায়াল দিতে গিয়ে ২,১৯৩ জন ভারতীয়র মৃত্যু হয়েছে। ১৩২ মৃত্যু (২০০৭), ২৮৮ মৃত্যু (২০০৮), ৬৩৭ মৃত্যু (২০০৯), ৬৮৮ মৃত্যু (২০১০), ৪৩৮ মৃত্যু (২০১১)। এদের মধ্যে মাত্র ২২টি ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। ২০১২-র জানুয়ারিতে ক্লিনিকাল ট্রায়ালে মারা গেছেন ৩০ জন।
- জমি-ঠিকাদারী-অবৈধ ব্যবসার সাথে যুক্ত মাফিয়াচক্র নিয়োজিত ভাড়াটে খুনীদের গুলিতে 'অরুণাচল টাইমস্'র সহযোগী সম্পাদক ও সাংবাদিক টংরাম রিনা গুরুতর আহত হন। ওদিকে মণিপুরের একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন সাতজন পত্রিকা সম্পাদককে খুনের হুমকি দিয়েছে।
- ভারতীয় বংশোদ্ভুত মার্কিন নভোচর সুনীতা উইলিয়াম দ্বিতীয়বার মহাকাশের আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে (ISS)-র উদ্দেশ্যে ১৫ জুলাই'১২ 'সোয়ুজ টি এম এ' করে কাঝাখাস্তানের বৈকানুর উৎক্ষেপন কেন্দ্র থেকে যাত্রা শুরু করলেন। সাফল্যের সাথে ISS মেরামতীর চার মাস পর ফিরে আসেন।
- ভারতের শীর্ষ আদালত আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের লুপ্ত প্রায় জনজাতিদের বিশেষত বাণিজ্যিক পর্যটনের শিকার জারোয়া সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে জারোয়া সংরক্ষিত এলাকার বাইরে পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন রকম বাণিজ্যিক ও পর্যটন সংক্রান্ত কার্যকলাপ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন।
- কর্ণাটকের মাইশোরে অনুষ্ঠিত হওয়া 'কমিটি অন স্পেস রিসার্চে (COSPAP)'-র সম্মেলনে যোগ দেওয়া বিশ্বের ৭৪ দেশের ২৫০০ মহাকাশ বিজ্ঞানী সিদ্ধান্তে এসেছেন যে তারা এখনবধি ব্রহ্মান্ডের মাত্র ৪% সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।

স্মরণিকা

ড: রামদয়াল মুণ্ডা

স্বাধীনতা লাভের আগে থেকে দক্ষিণ বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলে আদিবাসীদের স্ব-শাসনের দাবিতে যে শক্তিশালী ঝাড়খণ্ড আন্দোলন চলছিল আশির দশকে তা তীব্র আকার ধারণ করে নতুন ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনে পরিণতি লাভ করে। তখন একাধারে যৌথ আন্দোলনে সামিল আবার পারস্পরিক যুযুধমান ঝাড়খণ্ড দলগুলি আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যে পিতৃবৎ চরিত্রের কথা ফেলতে পারত না তিনি হলেন ড: রামদয়াল মুণ্ডা। ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনে ড: মুণ্ডার অবদান অসামান্য। একাধারে সঙ্গীতজ্ঞ, বাদক, নর্তক, বহুভাষাবিদ, লেখক, গবেষক, নৃতত্ত্ববিদ, প্রতিষ্ঠান-সংগঠক ড: মুণ্ডা। তাঁর ১৯৩৯ সালে রাঁচী জেলার প্রত্যন্ত দিউরি গ্রামে দরিদ্র মুণ্ডা পরিবারে জন্ম। আমলেশা গ্রামে মিশনারি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ। মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার জন্য ৪০ কি.মি. দূরে মহকুমা শহর খুন্তীতে গমন। বীরসা ভগবানের কর্মকান্ডসিক্ত খুন্তীতে থাকার সময় বিদেশি নৃতত্ব গবেষকদের সংস্পর্শে এসে নৃতত্ত্বে অনুরাগ। নৃতত্ত্বে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ও আদিবাসী ভাষা নিয়ে পি. এইচ. ডি. করেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। শিকাগো ও মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা। দেশে ফিরে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ে আদিবাসী ও আঞ্চলিক ভাষা বিভাগের দায়িত্বভার নেওয়া। তারপর রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। এর পাশাপাশি ছাত্রাবস্থা থেকে উপাচার্য স্তর অবধি আদিবাসী গান ও নাচের চর্চা ও দলগঠন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে আদিবাসী সংস্কৃতির বিকাশের মধ্য দিয়েই আদিবাসীরা বেঁচে থাকবে। তাই আদিবাসীদের জল-জমিন-জঙ্গলের অধিকারের লড়াইয়ের সাথে সাথে ভাষা-নাচ-গান-শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশের আন্দোলনও গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর চেষ্টাতেই ঝাড়খণ্ডের গ্রামগুলিতে আদিবাসী আখড়াগুলি পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে। মৃত্যুর আগে অবধি 'সারা ভারত আদিবাসী মহাসভার' ব্যানারে সারা দেশের বৈচিত্র্যময় আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি মঞ্চে আনার চেষ্টা করছিলেন। তিনি সঙ্গীত নাটক একাদেমী ও পদ্মশ্রী পুরস্কার পান। তিনি ছিলেন রাজ্যসভার ও জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, রাষ্ট্রপুঞ্জের জনজাতি সংক্রান্ত কার্যানির্বাহী দলের উপদেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক জনজাতি ও আদিবাসী মহাসঙ্ঘের আধিকারিক। আদিবাসীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দীর্ঘ পেটানো চেহারার ও আজানুলম্বিত চুলের অধিকারী ড: মুণ্ডাকে সকলের সাথে নাগোরা বাজাতে বাজাতে আর নাচতে দেখা যাবে না।

মামনি রায়সম

অসমিয়া সমাজের জীবন যন্ত্রণা চার দশকের বেশি সময় ধরে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে এঁকে চলেছিলেন ইন্দিরা গোস্বামী ওরফে মামনি রায়সম। সকলের প্রিয় 'বড় দিদি'। বলা হয় মামনি রায়সম যখন বলেন অসমবাসী তখন শোনেন। সারাজীবন বাঙ্ময়ভাবে তিনি নারী ও প্রান্তিক মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে এসেছেন। তিন দশকের বেশি হিংসা ও গৃহযুদ্ধের পর অসমে শান্তির বাতাবরণ রচনায় তাঁর ছিল প্রধান ভূমিকা। 'সম্মিলিত জাতীয় আবর্তন' ও 'পিপলস্ কনসালটেটিভ গ্রুপ (PCG)' গড়ে তুলে দীর্ঘ প্রচেষ্টায় তিনি সরকার ও 'আলফা'কে এক আলোচনার টেবিলে বসাতে সক্ষম হন। ১৯৪২এ কামরূপের ঐতিহ্যময় বৈষ্ণব 'সত্রে'র অধিকারী বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম ও প্রবল ধর্মীয় অনুশাসনে বড় হওয়া। পরবর্তীকালে তাঁর বিখ্যাত 'দাঁতাল হাতীর উনে খাওয়া হাওদা' বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি ধর্মীয় অনুশাসনে দীর্ণ নারীর যন্ত্রণা প্রস্ফুটিত করেন। শিলং ও গুয়াহাটিতে পড়াশুনা। গোয়ালপাড়ায় শিক্ষকতা, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। সেখানে আধুনিক ভাষা সাহিত্যের প্রধান এবং এমারিটাস অধ্যাপক। বিয়ের মাত্র দুবছরের মধ্যে মাত্র ২৩ বছর বয়সে কাশ্মীরে পথ দুর্ঘটনায় স্বামীর মৃত্যু। 'রামায়ণ — গঙ্গা টু ব্রহ্মপুত্র', 'মামারে ধারা তরোয়াল আর দুখন উপন্যাস', 'নীলকণ্ঠব্রজ', 'পেজেস স্টেইনড উইথ ব্লাড', 'আধলেখা দস্তাবেজ', 'দি চেনাব'স কারেন্ট' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি সাহিত্য একাদেমী, জ্ঞানপীঠ, প্রিন্স ক্লস এওয়ার্ড, কথা সম্মান, ভারত নির্মাণ সম্মান, ডি. লিট সহ অসংখ্য সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিতা।

বাদল সরকার

অসাধারণ নাট্য ব্যক্তিত্ব যিনি নাটককে রঙ্গমঞ্চ থেকে নিয়ে এসেছিলেন আমজনতার দরবারে, খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিদিনকার লড়াইয়ের ময়দানে। জন্ম ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে। পারিবারিক নাম সুধীন্দ্রনাথ। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্নাতক, ইংল্যাণ্ডে টাউন প্ল্যানার রূপে কর্মজীবন। ১৯৬৭-র বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ তাঁর প্রাণে অনুরণন ছড়ায়। উদীয়মান কৃষক সংগ্রামের উপর নৃশংস রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন তাঁকে রক্তাক্ত করে। নাটককে বেছে নেন প্রতিবাদের মাধ্যম হিসাবে। তাঁর হাতে পড়ে নাটক হয়ে ওঠে প্রসেনিয়ামের বাইরে এক জীবন্ত জনপ্রিয় গণমাধ্যম।

১৯৬৭-তেই গড়ে তোলেন 'শতাব্দী' নাট্যগোষ্ঠী। তারপর 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'স্পার্তাকাস', 'মিছিল', 'ভোমা', 'পাগলা ঘোড়া', 'বাসি খবর' প্রভৃতি একটার পর একটা সফল সৃষ্টি নিয়ে গ্রাম নগর মাঠ পাথার বন্দরে ছুটে বেড়ান। পুলিশ-প্রশাসনের রক্ত চক্ষু, রাজনৈতিক গুন্ডাদের আক্রমণ কোন কিছুই তাঁকে টলাতে পারেনি। তাঁর অনন্য নাট্যশৈলী বাংলার গন্ডি পেরিয়ে হিন্দি বলয়ে জনপ্রিয়তা পায়। তাঁর নাটক বহু ভাষায় অনুদিত হয়ে মঞ্চস্থ হয়। নানাবিধ পট পরিবর্তনের মধ্যেও এই প্রতিভাবান শিল্পী আমৃত্যু ছিলেন আপোষহীন। দু-দুবার পদ্মভূষণ খেতাব ফিরিয়ে দেন। রাজ্যের বাম সরকারের উপেক্ষা সত্বেও বামপন্থা ও প্রগতিশীলতায় আস্থা হারান নি। তিনি যে মানুষের আপনজন ছিলেন।

গুরশরণ সিংহ

পাঞ্জাবের এই অকুতোভয় নাট্য ব্যক্তিত্ব ৮২ বছর বয়সে চলে গেলেন। রেখে গেলেন বিপ্লবী গণনাট্যের এক সমৃদ্ধিশীল ঐতিহ্য, বিখ্যাত 'বাবা বোলতা হ্যায়', 'জঙ্গিরাম কি হাভেলি' 'গাড্ডা' সহ ১৫০ টিরও বেশি নাটক। ১৬ বছর বয়সে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। সারাজীবন সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে গ্রামীণ সহজ ভাষায় স্থানীয় বিষয় নিয়ে জনপ্রিয় নাটক রচনা করেছেন এবং সেগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে মঞ্চস্থ করে গেছেন। জরুরি অবস্থায় 'মিথ্যা সঙ্ঘর্ষের' নামে হত্যা প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করায় তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হয়। আবার খালিস্থানী আন্দোলনের সময় সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করে তিনি গ্রামে গঞ্জে বিপ্লবী শহীদ ভগৎ সিংহের আদর্শ প্রচার করে বেড়ান। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর হিন্দি বলয়ে ১৯৮৫ তে 'জন সাংস্কৃতিক মঞ্চ' (জ স ম) গঠনের তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা, এবং 'জ স ম'-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। এছাড়াও তিনি শিল্পাঞ্চলের ট্রেড ইউনিয়ন ও গণ আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ছিলেন 'ইন্ডিয়ান পিপলস্ ফ্রন্টের' জাতীয় উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য।

ড: ভূপেন হাজারিকা

'আমার গানের হাজার শ্রোতা
তোমায় নমস্কার
গানের সভায় তুমিই তো প্রধান অলঙ্কার ...'

চলে গেলেন প্রবাদ প্রতিম সঙ্গীত শিল্পী ড: ভূপেন হাজারিকা।

'এই কাজল কাজল দিঘি আর পদ্মপাতার নাল
দেখি মনে পড়ে হিজল ফুলি আলতা দুলি পা
সেই তো আমার মা চাঁদ উজালি মা ...'

অসমের সংস্কৃতি জগৎ অভিভাবক হারা হল।

'বিস্তীর্ণ দুপাড়ে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে
ও গঙ্গা তুমি বইছ কেন?' ...

তাঁর দীর্ঘজীবনের বিস্তৃত অধ্যায়ে তিনি সমাজ সচেতনতার গানই গেয়ে গেছেন।

'বিমূর্ত ঐ রাত্রি আমার মৌনতা এই সুতোয় বোনা
একটি রঙীন চাদর
সেই চাদরের ভাঁজে ভাঁজে নিঃশ্বাসের ছোঁয়া
আছে ভালবাসার আদর —
দূরের আর্তনাদের নদীর ক্রন্দন কোনো ঘাটে
দুঃখের খেই পেয়েছি আমি আলিঙ্গনের সাগর
সেই সাগরের স্রোতে আছে নিঃশ্বাসেরও ছোঁয়া
আছে ভালবাসার আদর ...'

সারাজীবন ভালোবাসার কথা বলে গেছেন।

'মানুষে মানুষের বাবে
মানুষ মানুষের জন্য
হৃদয় হৃদয়ের জন্য
একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না ...'

আর বলে গেছেন শুধু মানুষের কথা।

'আজ জীবন খুঁজে পাবি
ছুটে ছুটে আয় ...'

শুধু জীবনের কথা।

'মোরা যাত্রী এক তরনীর
সহযাত্রী এক ধরণীর ...'

সাম্যের কথা।

'দোলা দোলা
আঁকাবাঁকা পথে মোরা
কাঁধে নিয়ে ছুটে যাই
রাজা মহারাজাদের দোলা
আমাদের জীবনের ঘামে ভেজা শরীরের
বিনিময়ে পথ চলে দোলা ...'

শোষণের ও বৈষম্যের কথা।

'শরৎবাবু খোলা চিঠি দিলাম তোমায়
তোমার গফুর মহেশ এখন কেমন আছে জানিনা

গেল বছর বন্যা হোলো এ বছর খরা
একটুকু ঘাস পায় না মহেশ-
এক মুঠো ভাত খেতে না পায় গফুর-আমিনা —
শরৎবাবু জানিনা আমার এ চিঠি পাবে কি না? ...'

সঙ্কটের কথা।

'সজনী সজনী পদ্মাপাড়ে ছিলাম
সজনী সজনী পদ্মা পার হইলাম
সজনী সজনী চাকরি তো খুঁজেছি
সজনী সজনী ঘর-বাড়ি ছেড়েছি
সজনী সজনী থাকব না আর ফরিদপুরেতে ...'

সমস্যা অভাবের কথা।

'ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ ডম্বরু মেঘে ডাকে ডম্বরু
ঝিকিমিকি বিজলি নাচে
ছোটো ছোটো গাঁয়ে ছোটো ছোটো মানুষের
ছোটো ছোটো কুটির কাঁপে
ঘুণ ধরা সমাজের অন্যায় ওরা পায়ে দলে যায় ...'

পরিবর্তনের কথা।

'সময়ের অগ্রগতির পক্ষীরাজে চড়ে
যাব আমি নতুন দিগন্তে এই হাসি মুখে
নাই আক্ষেপ কোনো পাওয়া না পাওয়ার
সামনে রয়েছে পথ এগিয়ে যাওয়ার
সত্য কে সারথি আসে দিন আসে রাত বিরামহীন
উড়ন্ত মন মানে না বাঁধা
সূর্য্যকে ধ্যান করে নাচে মন নাচে প্রাণ
আশঙ্কাবিহীন ...'

নতুন পৃথিবীর কথা।

'নতুন পুরুষ নতুন পুরুষ
তুমি নয় ভীরু কাপুরুষ ...'

নতুন মানুষের কথা।

'এখানে বৃষ্টি মুখর লাজুক গাঁয়ে
এসে থেমে গেছে ব্যর্থ ঘড়ির কাঁটা ...'

আশাবাদের কথা।

'শীতের শিশির ভেজা রাতে ...'

প্রকৃতির অপরূপ বর্ণময়তার কথা।

'হস্তীর নাড়ান হস্তীর চাড়ান হস্তীর মাথায় বারি
ও কি ওরো সত্য কইরা কহেন মাহুত ভাই
ঘরে কয়খান নারী
তোমরা গেইলে কি আসিবে ও মাহুত বন্ধু রে ...'

গোয়ালপাড়ার ভাওয়াইয়ায় ফুটিয়ে তুলেছেন বিরহ যন্ত্রণা।

'একটি কুঁড়ি দুটি পাতা রতনপুর বাগিচা
কোমল কোমল হাত বাড়িয়ে
লছমি আজও দোলে ...'

চা-বাগিচার জীবন সঙ্গীত।

'আমায় ভুল বুঝিস না
মাইয়া ভুল বুঝিস না ...'

বিহুর পাগলা সুরে মনমাতানো সব গান।

'ইবার দিব দালান-কোঠা মা শীতলার কিড়াকাঠি
টাটালগর কারখানাতে করিবো গো চৌকিদারি
ও ও রূপসী করবো তুমার মন খুশী ...'

আদিবাসীদের প্রাণের গান।

'মোর গাঁয়ের সীমানায় পাহাড়ের ওপারে
নিশিথ রাত্রির প্রতিধ্বনি শুনি ...'

মিশমি পাহাড় ভেঙ্গে ডিহাং নদী যেখানে ব্রহ্মপুত্র রূপে আসাম উপত্যকায় প্রবেশ করেছে, সেই পাহাড়-সমতল-জঙ্গল-আদিবাসী অধ্যুষিত সদিয়ায় এক মধ্যবিত্ত শিক্ষক পরিবারে জন্ম। সুগায়িকা মায়ের লালাবাই, পাহাড়িয়া ও আদিবাসী মেয়েদের গান এবং পাখিদের সুমিষ্ট রব শুনে বড় হওয়া ভূপেন হাজারিকা অসংখ্য গান করেছেন, সুর দিয়েছেন, লিখেছেন, অসমিয়া, বাংলা, হিন্দি, ইংরাজি বহু ভাষায়। গুয়াহাটি কটন কলেজের স্নাতক, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতোকত্তর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলার। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি। অন্যায়ের প্রতিবাদে ইস্তফা। আই. পি. টি.-এর কাজে বম্বে আগমন।

'মৌন রাতি আছে চারিদিকে
দিগন্তে সূর্য্য কোথায়?
প্রভাতী পাখীরা কেন গায় ...।'

তিনি একাধারে গায়ক, সুরকার, গীতিকার, সংস্থাপক, যন্ত্রব্যবস্থাপক, কবি, লেখক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, অভিনেতা, চলচ্চিত্র নির্দ্দেশক, চলচ্চিত্রের সঙ্গীত নির্দ্দেশক, সমাজ কর্মী, সমাজ সংস্কারক, জন-প্রতিনিধি ...। মাত্র ১৩ বছর বয়েসে অসমিয়া চলচ্চিত্রে অভিনয়। বহু জনপ্রিয় অসমিয়া, বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রের সংগীত নির্দ্দেশক বা সঙ্গীত পরিচালক।

'রাত্রি তোমার নাম রাত্রি তোমার নাম
অঙ্গে অঙ্গে মধু জোছনা লুকোচুরি করে ...'

একবাক্যে সকলেই স্বীকার করেছেন যে তিনি শঙ্করদেব-জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়াল পুষ্ট অসমিয়া সংস্কৃতির মূল স্রোতকে অসমের বিস্তৃত বহুত্ব সহজিয়া লোক ও আদিবাসী সংস্কৃতির সাথে সুন্দরভাবে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। অসমিয়া শিল্প-সংস্কৃতির উন্নতধারাকে অবশিষ্ট ভারত ও বিশ্বের কাছে মেলে ধরেছেন।

'আকাশী গঙ্গা খুঁজিনিতো না খুঁজিনি স্বর্ণ অলঙ্কার
নিষ্ঠুর জীবনের সংগ্রামে পেয়েছি প্রেরণা ভালবাসা ...'

৫০-র দশকে অসম যখন জাতিদাঙ্গায় বিদীর্ণ তিনি তখন বিপ্লবী সংস্কৃতি সংগঠক বিষ্ণু রাভা, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, মঘাই ওঝাদের সঙ্গে সারা অসম ঘুরে গান দিয়ে দাঙ্গা থামিয়েছিলেন। ৬০-র দশকেও হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিহত করেছেন ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা।

'প্রথম না হয় দ্বিতীয় না হয় তৃতীয় শ্রেণীর আমরা সবাই
জীবন রেলের যাত্রীরে ভাই ...'

তিনি জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়াল, আব্বাসউদ্দীন, বিষ্ণু রাভাদের সাথে কাজ করেছেন। ছিলেন পল রোবসন-পিট শিগার-হ্যারি বেলাফন্টেদের বন্ধু। সলিল চৌধুরী-বলরাজ সহানীদের সহযোদ্ধা। হেমন্ত মুখার্জী, লতা মঙ্গেশকর, প্রতিমা বড়ুয়া, রুণা লায়লা-দের সহশিল্পী। এনেছেন গুলজার, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়দের মরমী কথায় প্রাণের সুর। কল্পনা লাছমি, সাই পরাঞ্জপে, মকবুল ফিদা হুসেন প্রমুখদের চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালক।

'মুই এটি যাযাবর
আমি এক যাযাবর
পৃথিবী আমাকে আপন করেছে
ছেড়েছি নিজের ঘর ...'

তিনি ছিলেন এক বিশ্ব পথিক, যিনি শান্তি, সম্প্রীতি ও প্রগতির গান গেয়ে গেছেন।

'জীবন নাটকের নাট্যকার কি বিধাতা পুরুষ
যেই হোক নাটক লেখার মত নেই তার হাত
সে নাটকে অভিনয় করতে গিয়ে দেখি দিনকে করেছে রাত ...'

ধর্মীয় ও জাতিগত ভেদাভেদ বিশেষ করে নিম্নবর্ণকে অপাংতেয় করে রাখার কূটকৌশল তাকে নতুন সমাজবীক্ষায় উন্নীত করেছে।

'জীবনটা যদি অভিনয় হয় অভিনয় যদি জীবন হয়
আকাশ যদি কাগজ হয় চাঁদটা যদি আসল না হয়
সেই জোছনার কি মানে ...?'

বারবার সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন।

'আগুন ভেবে যাকে কাছে ডাকিনি ...'
মন তবু তারে চায়

অন্য সম্প্রদায়ের হওয়ায় যৌবনের প্রেয়সীকে না পাওয়ার অব্যক্ত যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলেছেন গানে।

'প্রেম আমার শত শ্রাবণের বন্যা আনে ...'

গভীর বিরহে প্রবল বেদনা পেয়ে গেছেন।

'আমি ভালোবাসী মানুষকে
তুমি ভালোবাসো আমাকে
আমাদের দুজনের সব ভালোবাসা
বিলিয়ে দাও এই দেশটাকে ...'

পরে কৃতি নারী প্রিয়ংবদা প্যাটেলকে বিবাহ। অসমে গিয়ে যৌথ কাজ শুরু। পুত্র তেজের জন্ম। কিন্তু এই সম্পর্ক টেকে না।

'এক খানা মেঘ ভেসে আসে আকাশে
এক ঝাঁক বুনো হাঁস পথ হারালো
একা একা বসে আছি জানালা পাশে
সে কি আসে যাকে আমি বেসেছি ভালো ...'

নানা ভাঙ্গাগড়া। শোনা যায় প্রতিমা বড়ুয়া, মহারাণী গায়ত্রী দেবীদের সংগে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া।

'চিত্রলেখা চিত্রলেখা চিত্র তুমি আঁকো
চিত্রপটে চিন্তাশীল এক চিন্তানায়ক আঁকো না ...'

মধ্যবয়সে সপ্তদশী গুরু দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী কল্পনায় থিতু হওয়া। তারপর তাদের চল্লিশ বছরের অবিবাহিত দৃঢ় সম্পর্কের আমৃত্যু উদযাপন।

'সবুজ প্রান্তরে তোমার নিরালা ঘরে
বিদায়বেলায় ভেবেছো যে কথা বলবে হয়তো বা ভুলে গেছো...'

অসুস্থতার শেষ বছরগুলিতে কল্পনা লাছমি কর্তৃক মুম্বাইয়ে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা।

'আর ফুল নয় আর মালা নয়
নয় ফাগুনের কোনো কাব্য
মধু রাত নয় মায়া চাঁদ নয়
মানুষের কথা ভাববো, শুধু মানুষের কথা ভাববো ...'

গণ আন্দোলনের পর '৬৭ তে নির্বাচিত হয়ে সংসদের মধ্যে মানুষের কথা বলা। পরে জাতিগত দাঙ্গার বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে, হিংসার বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতায়, জাতীয় ঐক্যের পক্ষে ভূমিকা রাখা।

'সহস্র জনে মোরে প্রশ্ন করে
বেদের মন্ত্র নয় হৃদয়ের মন্ত্র মোর মদিরা ...'

পরে জাতীয়তার পক্ষে যেতে গিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের প্রচারে সাময়িক ভেসে যাওয়া। জনতা কর্তৃক ওই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান, কিন্তু সার্বিক জনপ্রিয়তা অটুট থাকে। নিজেরও পরবর্তিতে ভুল স্বীকার। পুনরাবৃত্তি না করা।

'গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা,
দুই চোখে দুই জলের ধারা মেঘনা যমুনা ...।'

আমৃত্যু সুরেলা সঙ্গীতের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন দেশ ও জাতির অভিন্ন ঠিকানা।

'মানসী বিদায় তোমাকে বিদায়
ফুলে মালা চন্দনে সাজিয়ে দিলাম চিতায় ...'

অসমবাসী সহ সমস্ত গুণমুগ্ধ ব্যক্তি এই বর্ণময়, বিশাল মাপের, বহুপ্রতিভাধর জনপ্রিয় গায়ককে অশ্রুসজল চোখে বিদায় জানিয়েছেন। টুপি পরিহিত অনায়াস যন্ত্রসঞ্চালনে সেই আসর মাত করে দেওয়া দীর্ঘাকৃতি অবয়বকে আর কোনো দিন দেখা যাবে না। শোনা যাবে না সেই দরাজ হাসি আর ভুবনবিজয়ী চাপা সুরেলা ব্যারিটোন কণ্ঠকে।

...বিদায় ডঃ ভূপেন হাজারিকা!

নিবেদন : অরণি সেন